আমাদের সোনালি আঁশ ও আগামীর অর্থনীতির সোপান

পাট বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার শাসনামলেই অনুধাবন করেছিলেন ‘পাটের গবেষণায় বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে’। বিশ্বব্যাপী আঁশ উৎপাদনকারী ফসল হিসেবে তুলার পরেই পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের অবস্থান। বিশেষত, সোনালি আঁশ খ্যাত ‘পাট’-এর সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির সম্পর্ক অনেক গভীর। বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে পাটের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবেশবান্ধব তন্তু (ফাইবার) হিসেবে পাটের চাষ ও পাট পণ্যের ব্যবহার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে পাট পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন এবং ব্যবহার সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার পাটজাত পণ্যকে ইতিমধ্যেই বর্ষপণ্য-২০২৩ এবং সোনালি আঁশ খ্যাত পাটকে কৃষিপণ্যের স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছে। পাট একটি পরিবেশবান্ধব উদ্ভিদ যার পুরো অংশই ব্যবহারযোগ্য। বাংলাদেশে প্রধানত দেশি ও তোষা পাট এবং পাট জাতীয় আঁশ ফসল কেনাফ ও মেস্তা চাষ হয়ে থাকে, যা ১১০-১২০ দিন সময়ের মধ্যেই কাটা হয়। বর্তমানে দেশের প্রায় ৪৫ লক্ষ কৃষক পাট চাষে জড়িত।

আশির দশকে প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৬০-৬৫ লক্ষ বেল (১ বেল = ১৮০ কেজি) পাট উৎপাদিত হতো। পরবর্তীতে ৯০-এর দশকে তা হ্রাস পেয়ে ৪৫ লক্ষ বেল-এ নেমে যায়। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষি ও কৃষকবান্ধব পদক্ষেপের কারণে ২০১০ সালে ৭-৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ৮০-৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয়।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ০৪ শতাংশ আসে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে। এছাড়া পরোক্ষভাবে কৃষি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দিক বিবেচনায়, এক হেক্টর জমিতে পাট চাষ পরবর্তী প্রায় ৮ মেট্রিক টন জৈব পদার্থ মাটিতে যুক্ত হয় যা মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণসহ উর্বরতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৯৫১

সালে কৃষি মন্ত্রণালয়েরে উদ্যোগে ঢাকায় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট। বর্তমানে ঢাকার শেরে-বাংলা নগরের মানিক মিয়া এভিনিউ-তে অবস্থিত এই গবেষণাগার বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিজেআরআই) নামে পরিচিত।

অদ্যাবধি, বিজেআরআই পাট ও পাট জাতীয় ফসলের ৫০টির উপরে জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় পাট উৎপাদন হলেও ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জামালপুরই প্রধান পাটচাষ অঞ্চল। সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদিত হয় ফরিদপুর জেলায়।

পাট ও পাট পণ্যের উন্নয়নে কাজ করা বিজেআরআই, জুট ডাইভারসিফিকেশান প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) ও বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনকারী দেশীয় উদ্যোক্তাগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী, মেলা, সেমিনার, সভা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলার সেই পাট-কেন্দ্রিক কৃষি অর্থনীতির পূনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তারা দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এই পর্যন্ত ২৮২ ধরনের পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাট পণ্যের উৎপাদন ও এর ব্যবহারের মাধ্যমে একটি টেকসই পরিবর্তনের ঢেউ দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, পাটের সোনালি আঁশ ও রুপালী কাঠি (পাটকাঠি) দুয়েরই রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সোনালি আঁশ নামে পরিচিত বাংলাদেশের পাট পরিবেশবান্ধব এবং বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য একটি আঁশ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্য অনেক আঁশের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

পাটের বস্তা এখনো দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। অন্য ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে সুতা, পাকানো সুতা, চট, জিওটেক্সটাইল, কার্পেট ব্যাংকিং, কাগজ তৈরির পাল্প, কৃত্রিম রেয়ন, পর্দার কাপড়, কুশন কভার এবং গরম কাপড় তৈরির জন্য উলের সঙ্গে মিশিয়েও পাট ব্যবহার করা হয়।

উপজাত হিসেবেও পাটের আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে প্রসাধনী, ওষুধ, রং ইত্যাদি খাত। সম্প্রতি পাট থেকে জুট পলিমার তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ড. মোবারক আহমেদ খান যা ‘সোনালি ব্যাগ’ নামে পরিচিত। পাটের কচি পাতা শাক হিসেবেও খাওয়া হয়।

অন্যদিকে ঘরের বেড়া, ছাউনি এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয় পাটকাঠি। বাঁশ এবং কাঠের বিকল্প হিসেবে পার্টিকেল বোর্ড, কাগজের মণ্ড ও কাগজ তৈরিতেও পাটকাঠি ব্যবহার হয়। পাটকাঠি পুড়িয়ে তৈরি কার্বন বা চারকোল (কয়লা) জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই চারকোল অনেক দেশেই (যেমন চীন, ব্রাজিল, তাইওয়ান) রপ্তানি হয়, যেখানে এটি উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় কম্পিউটার প্রিন্টারের কালি, ফটোকপি মেশিনের কালি ও কসমেটিক্স উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এ থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি আমরা অধীক দামে দেশে আমদানি করে থাকি। এছাড়া পাটকাঠি দিয়ে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বেড়া তৈরি, গাড়ির ডেস্কবোর্ড তৈরি করা হয়।

বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, মায়ানমার, চীন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ব্রাজিল এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি দেশে পাটের চাষাবাদ হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮০ শতাংশ পাট বিশ্ববাজারে রপ্তানি হতো। পরবর্তীতে, সত্তর-আশির দশকে পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববাজারে কৃত্রিম তন্তুর আবির্ভাবের কারণে পাট রপ্তানি নিম্নমুখী হয় এবং বর্তমানে বিশ্ব চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগ পাট বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশ রপ্তানি ব্যুরো (ইপিবি) এর তথ্য অনুযায়ী, বিগত অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে পাট পণ্য থেকে রপ্তানী আয় হয়েছে ৬৯ কোটি ৬০ লাখ ডলার (প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা), যা পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে, পাট উৎপাদন থেকে শুরু করে পাট সংগ্রহ, সংরক্ষণ-এবং যুগোপযোগী পণ্য তৈরিসহ সবকিছুতে আরও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। তাই পাটের চাষ বৃদ্ধি করতে কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধাসহ যাবতীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করতে হবে।

পাটের ব্যাপক চাষাবাদ, বন্ধ পাটকলগুলো চালু করা, পাটের বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদির ফলে কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে। এর ফলে পাট চাষিদের মধ্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা বাড়বে এবং উত্তরোত্তর বাড়বে পাট চাষ। এছাড়া বহুমুখী পাটপণ্য তৈরির এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা অপরিসীম। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে সম্ভাবনাময় পাটপণ্য বহুমুখীকরণ খাতটি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে এক শক্তিশালী স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম এই দেশের সোনালি আঁশ পাট।

২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তর করার স্বপ্ন আজ দ্বারপ্রান্তে।

লেখক: অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

এশিয়ার সর্ববৃহৎ সার কারখানা: কৃষি উৎপাদন ও অর্থনীতি আসবে স্বস্তি

দ্রুত ফসল উৎপাদনের জন্য ইউরিয়া বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, গাছের সবুজ অংশের বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা প্রধান। সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ হয় ধান, গম, ভুট্টা চাষের জমিতে। পৃথিবীতে যত ইউরিয়া উৎপাদন হয় তার প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে।

কারখানাটি দেশের কৃষি উৎপাদন, কৃষি অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যে ইতিবাচক অবদান রাখবে। মাটিতে (ইউরিয়া) নাইট্রোজেন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি হলে ক্লোরোফিল সংশ্লেষণের হার কমে যায়। ফলে ফসলের স্বাভাবিক সবুজ বর্ণ হারিয়ে ফেলে। পাতার আকার ছোট হয় এবং শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি হ্রাস পায়, ফলে গাছ খর্বাকার হয় এবং ফলনে বিপর্যয় ঘটে। তাই কৃষিতে ইউরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় নবনির্মিত ‘ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা’ নামের এই কারখানাটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই কারখানায় বার্ষিক ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হবে।

উন্নত দেশ যেমন ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান থেকে যন্ত্রপাতি এনে এখানে কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। কারখানাটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, শক্তি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। জাপানের এম এইচ আই ও চায়না সিসি সেভেন কোম্পানি কারখানাটি নির্মাণ করেন। এটি চালু হলে শিল্পখাতে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। দেশের বাইরে থেকে সার

আমদানি হ্রাস পাবে ফলে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। মানুষের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এই কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ধরা হয়েছে ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব গ্রানুলার ইউরিয়া উৎপাদনে সক্ষম এই সার কারখানা দেশে ইউরিয়া সারের স্বল্পতা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশে কম-বেশি প্রায় ৩০ লাখ মেট্রিক টন সারের চাহিদা রয়েছে। ৬ থেকে ৭ লাখ মেট্রিক টন সার আমদানি করতে হয় প্রতি বছর।

দেশের অভ্যন্তরীণ ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটানো এবং সুলভ মূল্যে কৃষকদের কাছে সার সরবরাহ নিশ্চিতে নরসিংদীর পলাশে স্থাপিত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পরিবেশবান্ধব ‘ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা’। এটি চালু হলে দৈনিক ২৮০০ মেট্রিক টন করে বছরে গড়ে ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন সম্ভব হবে। ফলে সারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সারের জোগান বাড়ানো সম্ভব।

দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে বার্ষিক ৩ লাখ ৪০ হাজার এবং ১৯৮৫ সালে ৯৫ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন যথাক্রমে ঘোড়াশাল এবং পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপিত হয়।
কারখানা দুটি পুরোনো হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস এবং ডাউন টাইম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কারখানা দুটির জায়গায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, শক্তিসাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর একটি সার কারখানা নির্মাণের নির্দেশনা দেন।

সেই প্রেক্ষিতে বার্ষিক ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন গ্রানুলার ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে ‘ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পটি নেওয়া হয়। জাপানি প্রতিষ্ঠান এমএইচআই-এর কাছে কারখানাটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজারের প্রকল্প এর কারখানাটি যখন পুরোপুরি উৎপাদনে যাবে, তখন ৯৬৮ জন লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া ১৫০০ থেকে ২০০০ লোক কারখানায় বিভিন্নভাবে প্রতিদিন

কাজ করবে।

সার কাখানায় লোডিং-আনলোডিং, সার বস্তাবন্দি করা, প্যাক করা, ট্রাকে ট্রেনে উঠানো এসব জায়গায় কমপক্ষে দুই হাজার লোক কাজ করবে। এছাড়া এই কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ত্রিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। জাপানিজ কনসালটেন্টদের মাধ্যমে কারখানার প্রত্যেকটা কর্মকর্তা, অপারেটরদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, দেশে এবং বিদেশে।

বর্তমানে দেশের জনবল দিয়ে অপারেটিং সিস্টেম চালানো হচ্ছে, বিদেশিরা সাথে থাকছে। এতে করে দেশের কর্মকর্তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। কোনোরকম ভুল হলে তারা তা শুধরে দিচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছে। হাতে-কলমে ট্রেনিং দিচ্ছে। কারখানার অফিসার, অপারেটররা সক্ষম, তারা তাদের সামর্থ্য দেখাচ্ছে, তাদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। কারখানাটি এখন ট্রায়াল রানে আছে, কোনোরকম সমস্যা হচ্ছে কি না সবকিছুই নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। ট্রায়ালও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৪৩৬ একর জায়গার মধ্যে ১১০ একর জায়গা নিয়ে স্থাপিত কারখানাটি নির্মাণে ব্যয় হবে ১৫ লাখ ৫২০ কোটি টাকা। দেশের মোট সারের সিংহভাগ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে উৎপাদনে যেতে আর অপেক্ষা অল্প সময়ের।
এটি চালু হলে দেশের অন্যান্য কারখানায় চাপ কমার পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভরতা কমবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিরাট ভূমিকা রাখবে।

এই কারখানাটি বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে। পাশাপাশি সার আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাবে একই সঙ্গে কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি পাবে। দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

লেখক: কৃষি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ।

কর্মসূচি দিয়ে বিএনপি নেতারা কেন আত্মগোপনে?

বিএনপির দুটি ডেডলাইন। এক ১০ ডিসেম্বর, দুই ২৮ অক্টোবর। এই দুই তারিখে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হবে বলে ঘোষণা দেয় বিএনপি। ১০ ডিসেম্বর কিছুই হয়নি। একই ভাবে ২৮ অক্টোবরের পরও এখনও ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে যে সহিংসতা হয়েছে, তার দায় এড়াতে পারেনা দলটি। রাজনীতির নামে এই আগুন সন্ত্রাসের কারণে টানা

‘শান্তিপূর্ণ’আন্দোলন করা এই দলটির নেতারা এখন ছন্নছাড়া। গ্রেপ্তার হয়েছেন অনেক কেন্দ্রীয় নেতা। আত্মগোপনে প্রায় নেতা। স্যোশাল মিডিয়াতে অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে দায় ছাড়ছে বিএনপি। এতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মাঠ পযায়ের নেতাকর্মীরা।

২৮ অক্টোবরের সহিংসতার পরই গ্রেপ্তার হন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য নেতাদের আর মাঠে দেখা যায়নি। দলীয় কার্যালয়ও তালা মেরে রাখা হয়েছে। শুধু গোপন স্থান থেকে স্যোশাল মিডিয়ায় লাইভে এসে সরকারের সমালোচনা করে কর্মসূচি ঘোষণা করছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এছাড়া বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খানসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না। তারা কোথায় আছেন কেউ জানেন না। অথচ তারা জনসভায় গরম গরম কথা বলে কর্মীদের উজ্জিবিত করেছেন। সরকারের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবেন না বলেও নেতাকর্মীদের সামনে প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন।

নিজ দলের নেতাদের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না মাঠ পর্যায়ের বিএনপির কর্মীরা। কারণ ঈদের পর আন্দোলন, ৩১ দফা-১০ দফা-১ দফা আন্দোলন, ১০ ডিসেম্বরের পরে খালেদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে এরকম অবান্তর কথাবার্তা আর বারবার আন্দোলনে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক আগেই বিএনপির হাই কমান্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তারা। সর্বশেষ ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশ করে চূড়ান্ত আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার হঠানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিএনপির হাই কমান্ড। এতে নতুন করে তৃণমূলের

কর্মীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু ২৮ অক্টোবর পার হয়ে গেলেও সরকার পতনের কোন নামগন্ধ নেই। বরং ২৮ তারিখই হঠাৎ করে সমাবেশ স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে সমাবেশস্থল থেকে একপ্রকার পালিয়ে যেয়ে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের হতাশ করেছিল বিএনপির হাই কমান্ড।

কেন্দ্রীয় নেতাদের মতবিরোধ, হরতাল-অবরোধে কর্মীদের মাঠে নামিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের রাজপথে অনুপস্থিতি, সব মিলিয়ে এবার পুরোপুরি হতাশায় বিএনপির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। এর প্রমাণও ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। দল হরতাল ও অবরোধের মত কঠোর কর্মসূচি দিলেও দেশের বেশিরভাগ এলাকাতেই নেতাকর্মীদের হরতালের পিকেটিং বা অবরোধ সফল করে তুলতে মাঠে দেখা যায়নি।

সাধারণত রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতারা সব সময় থাকেন সামনের সারিতে। কারণ তিনি তাঁর দলের কর্মীদের পথপ্রদর্শ। ইতিহাসও তাই বলে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সামনের কাতারে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলনে রাজপথে সব সময় সক্রিয় ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে জনতার কাতারে ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজপথে আন্দোলনও করেছেন তিনি।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিএনপিবিরোধী ধারাবাহিক সংগ্রামে শেখ হাসিনার সাথে রাজপথে মিছিলের সামনে থেকেছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা। পুলিশের নির্যাতন সহ্য করেও মাঠ ছেড়ে যাননি তারা। শুধু ব্যতিক্রম বিএনপির ক্ষেত্রে। দলটির নেতারা বড় বড় কথা বলে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ আন্দোলনের সময় মাঠে নেই কোনো নেতা। কেউ কেউ গ্রেপ্তার হলেও বেশিরভাগ নেতা আত্মগোপনে চলে গেছেন। কর্মীদের কথা তারা ভাবছেন না তারা। বিএনপির মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে এখন হতাশা বিরাজ করছে। অনেকে বলছেন, বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে- কর্মীদের গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক আদর্শ না থাকলে কোনো নেতাই কর্মীদের কাতারে থাকেন না। যাদের দেশ ও কর্মীদের জন্য দরদ নেই তারাই এমন কর্মকাণ্ড করতে পারেন। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কর্মীদের তারা ক্ষমতায় যাওয়ার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তথ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) এমনটিই ইঙ্গিত করেছেন।

মঙ্গলবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিটিটিসি প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সদস্য সচিব আমান উল্লাহ আমান তার অনুসারীদের নিয়ে নয়াপল্টনের মঞ্চের পাশে অবস্থান নেয়। মঞ্চে অবস্থিত বিএনপির এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনা ছিল পুলিশের ওপর বর্বরোচিত ও নৃশংস হামলার মাধ্যমে পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া। প্রয়োজনে এক বা একাধিক পুলিশ সদস্যকে হত্যার মাধ্যমে দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা, যাতে করে একটি নতুন ইস্যুর সৃষ্টি হয়।

সিটিটিসির তথ্য বলছে, অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে কর্মীদের দিয়ে নাশকতা চালিয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের কথা তারা চিন্তা করেনি। অথচ তাদের নেতা হওয়া উচিত, যারা কর্মীদের ভালো-মন্দ বোঝেন। কর্মীদের বিপদে সবার আগে সামনে দাঁড়ান। বিএনপি নেতাদের অবস্থার ঠিক তার উল্টো। নিজেদের মঙ্গলের জন্য সবার আগেই তারাই আত্মগোপনে গেছেন। কর্মীদের কথা কেউ ভাবছেন না। এখন কর্মীরাও সেটি বুঝতে পারছেন। ধারাবাহিক অবরোধ কর্মসূচি দিলেও সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে দেখা মিলছে না কর্মীদের। এসব ঘটনা থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের বোঝা উচিত, তৃণমূলের কর্মীরা কী চাইছেন। শুধু গোপন স্থানে থেকে কিংবা লন্ডন থেকে ভিডিও বার্তা দিয়ে এখন তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করতে পারবেনা দলটি।

বিএনপি দুই বার ডেডলাইন দিয়েও বর্তমান সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করাতে পারেনি। এতদিন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার যে দাবি বিএনপি করে আসছিল ২ নভেম্বর পার হয়ে যাওয়ায় সেই সুযোগ আর নেই। বর্তমানে সরকার চাইলেও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আর চালু করতে পারবেনা। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হলে সংসদে দুই তৃতীয়াংশের বেশি সদস্যের সমর্থনে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কিন্তু ২ নভেম্বর বর্তমান জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে গেছে। তাই এখন সরকার রাজী হলেও বিএনপির দাবি অনুসারে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আইনগতভাবে করার সুযোগ নেই।

আত্মগোপনে থাকা বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে এখন দুটি পথ খোলা- হয় নির্বাচনে অংশ নিতে হবে অথবা নির্বাচন বর্জন করতে হবে। বিএনপি যেহেতু নির্বাচন মুখী দল তাই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের আগ্রহ নির্বাচন নিয়ে। এমনিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বর্জন করায় অনেকে

নেতাকর্মী হতাশ হয়েছেন। কেউ কেউ দলের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করেছেন, অনেকে জিতেছেনও। আগামী জাতীয় নির্বাচনে যদি বিএনপি অংশগ্রহণ না করে, তাহলে দলের কর্মীদের ধরা রাখা কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করেন জেলা পর্যায়ের নেতারা। এখন বিএনপি কী মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের কথা বিবেচনা করবে নাকি ২০১৮ সালের মতো নির্বাচন বর্জন করবে সেটিই দেখার বিষয়।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

স্থিতিশীল রাজনীতিতে বিদেশি শক্তির প্রভাব

আমরা যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে থাকি তাঁরা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তত্ত্বের বাইরে গিয়ে এড়াতে পারি না। বিশেষত বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য সমালোচনার খাতিরে ‘উপনিবেশবাদ’, ‘উত্তর-উপনিবেশবাদ’, ‘নয়া উপনিবেশবাদ’ ইত্যাদি তত্ত্বের প্রয়োগ চোখে পড়ে। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশি শক্তির যে প্রভাব, সেটি নিয়ে কারো ‘নয়া ঔপনিবেশিক’ কোনো বিশ্লেষণ চোখে পড়ছে না। বিষয়টি ভাবায় একারণে, নিকট অতীতেও যাঁরা বাংলাদেশে ‘সাম্রাজ্যবাদ’, ‘হেজিমনি’ ইত্যাদি নিয়ে সরব ছিলেন তাঁরাও বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশি শক্তির প্রভাব নিয়ে সেরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্যত্র বক্তব্য দিচ্ছেন না।

শুরুতে বলা প্রয়োজন, বর্তমান রাজনীতিতে বিদেশি শক্তির প্রভাব সৃষ্টি-প্রয়াসের ধরন নিয়ে। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে বসার আহ্বান জানান। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার আহবান জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, গত ৩১শে অক্টোবর ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক বৈঠক করেন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের সাথে। সেখান ব্রিটিশ হাইকমিশনার অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন। এভাবেই সম্প্রতি বিদেশি শক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। তাদের কথাবার্তা এবং ভূমিকা নিরপেক্ষ মনে হচ্ছে না। তাদের অভিপ্রায়ে একটি দলের ‘মুখপাত্রের’ ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেকারণে বিদেশি শক্তির এমন ভূমিকাকে যথেষ্ট সন্দেহের চোখেই দেখবার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিদেশি শক্তির এমন প্রভাবকে কর্তৃত্ববাদী আচরণ হিসেবেই তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করা যায়। যাকে বলা যায় ‘নয়া উপনিবেশ’। সেই সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান আচরণে নয়া উপনিবেশের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য, ‘রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ’ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে কি তাদের উদ্দেশ্য জোর করে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসানো, যাতে পরবর্তীকালে এদের সহায়তায় বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি আওয়ামী লীগ সরকার করতে দিতে রাজি নয়?

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পুরোপুরি কলোনিয়াল বা নয়া ঔপনিবেশিক লক্ষণাক্রান্ত। বিএনপির সভা-সমাবেশ বা কর্মসূচির ধরন দেখে এটি পরিস্কার, দলটি চায় যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা। নির্বাচন তাদের কাছে কোন বিষয় নয়। নির্বাচন যদি সুষ্ঠুও হয় আর তাতে যদি আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে তাতেও তারা নির্বাচনকে সুষ্ঠু বলবে না। বরং বিদেশি শক্তির প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় যাওয়াই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একারণে, নিজেদের দল গোছানো, সংলাপে সাড়াদান এসবে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নির্বাচনের সময় এলেই দলটির ক্ষমতার কথা মনে পড়ে, সংবিধান মেনে নির্বাচন হওয়াটা তাদের কাছে বড় বিষয় নয়।

দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট, বিএনপি চায় ‘ক্ষমতা’, আর তারা মনে করছে বিদেশি শক্তি তাদের মুখে তুলে খাইয়ে দিবে তা। কিন্তু বিদেশি শক্তির ভূমিকাকে এত সরল করে দেখার সুযোগ নেই। সেকারণেই তারা অনধিকার চর্চায় নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। ঘোলা জলে মাছ শিকারের অপেক্ষায় আছে। বাংলাদেশ যতই বলুক, ‘বাংলাদেশ কোন রাষ্ট্রের সাথেই বৈরিতা চায় না, সবার সাথেই বন্ধুত্ব চায়।’ তাতে বিদেশি শক্তির কিছু এসে যায় না। নয়া উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা যাদের লক্ষ্য তারা বিএনপিকে ব্যবহার করে দেশে ‘ডলার সাম্রাজ্যবাদ’ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ যারা

তারা এখন এটি বুঝবে না। ব্যবহৃত হওয়ার পর বুঝেও লাভ নেই। কারণ, জনগনের শক্তিকে না জাগিয়ে বিদেশ ভক্তি যারা করে তাদের কপালে বাংলাদেশের ক্ষমতা কখনো জুটবে বলে মনে হয় না। আমার কাছে মনে হয়, এরা দেশই বুঝে না এবং সময়ের ভাষা বুঝতে পারার মধ্যে নেই! যেকোনো রাজনৈতিক দলের জন্য এটি বড় ব্যর্থতা!

‘শর্তহীনভাবে সংবিধানের মধ্যে থেকে আলোচনায় রাজি থাকলে সংলাপে যেতে আপত্তি নেই আওয়ামী লীগের।’—আওয়ামী লীগকে এই যৌক্তিক দাবির বাইরে নেয়ার মত সামর্থ্য বিএনপির আপাতত নেই। থাকলে নিজ দেশের জনগণের ওপর নির্ভর করত তারা। বিদেশি ভুয়া উপদেষ্টার জন্ম দিয়ে, বিদেশি শক্তির ওপর ভর করে নয়া উপনিবেশের নব্য রাজাকারের ভূমিকায় দলটি যেতে চাইত না। বর্তমানে বিদেশি শক্তির চাওয়া আর বিএনপির চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য করা যাচ্ছে না।

কাজেই আওয়ামী লীগ যেভাবে বিদেশি শক্তির প্রভাব উপেক্ষা করেই নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে সেটি আসলে নয়া উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নিজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষারও লড়াই। অন্যদিকে নব্য রাজাকারের দল ও দোসর এদেশের সংবিধান মানবে সে প্রত্যাশা কেউই করে না। বর্তমানে যে দলগুলো বিদেশি শক্তিকে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নয় সেই দলগুলোই নির্বাচনে আসবে। বিদেশি শক্তি কি একে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলবে? নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে কখনোই বলবে না। ফলে বিদেশি শক্তির প্রভাব এড়াতে সংবিধান মেনেই নির্বাচন হওয়া উচিত। আশাকরি, আওয়ামী লীগ বিদেশি শক্তির কাছে নতি স্বীকার করবে না।

রাশিয়া, চীন কিংবা ভারত, তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র নয়া উপনিবেশের মানসিকতা থেকেই এটি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তাই উপনিবেশের শৃঙ্খল হাতে ছুটে চলেছেন!
বাংলাদেশের স্থিতিশীল রাজনীতিতে বিদেশি শক্তি তাদের নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য যে প্রভাব সৃষ্টি করতে চাইছে তা রুখে দিতে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী মুক্তিকামী প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

শেখ হাসিনা-একজন নেতা, একজন যোদ্ধা

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ, উন্নয়ন ও মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উন্নয়নে তার কোনো বিকল্প নেই। শেখ হাসিনার সততা, নিষ্ঠা, যৌক্তিক মানসিকতা, দৃঢ় মনোবল, প্রজ্ঞা ও অসাধারণ নেতৃত্ব বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে এক ভিন্ন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তিনি এখন বিশ্বখ্যাত নেতা হিসেবে পরিচিত।

আওয়ামী লীগ সব ধরনের শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার, প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেছে এবং অব্যাহত রেখেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এটি জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য কাজ করে আসছে। এই দল যখন ক্ষমতায় থাকে, তখন মানুষের ভাগ্যের উন্নতি হয়। এই দলের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৭৪ বছরের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাহসী কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে এবং তিনি জনগণের কল্যাণে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার অদম্য শক্তি, সাহস, মনোবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্ব বিস্মিত। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৯তম এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ২০তম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এদিকে বাংলাদেশকে ২০২৬ সাল থেকে ‘মধ্যম আয়ের দেশ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০৪১ সালে ‘উন্নত দেশ’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তার বড় প্রমাণ হলো গত কয়েক বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৬৫ জন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় দেশ।

শেখ হাসিনা ৪টি মাইলফলক দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ, যা ইতোমধ্যে একটা ধাপ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

(এসডিজি), তৃতীয়টি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং চতুর্থটি হচ্ছে ২১০০ সালের মধ্যে ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন করা। গত ১৫ বছরে দেশ পেয়েছে পদ্মা সেতু ও রেল সেতু। ঢাকা মেট্রোরেল, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিক তৃতীয় টার্মিনাল, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসের প্রতিশ্রুতি তিনি অসম্পূর্ণ রাখেননি।

এরমধ্যে রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি মন্থর হয়ে পড়লেও তিনি এর প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে দেননি। নতুন সেতু ও সড়কের মাধ্যমে অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোভিড-১৯ মহামারিতে দলের অগণিত নেতা-কর্মী সবার পাশে দাঁড়িয়েছেন। নৌকা দ্রুত গতিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে এখন আলোর পথে।

শেখ হাসিনা এমন একজন নেতা এবং বিশ্বের কাছে আলোর আলোকবর্তিকা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে শুধু একটি বিরল মাত্রাই দেননি, বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে জোরদার করেছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রায়ই তাকে শুধু জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে অভ্যস্ত, যা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়, কিন্তু যথেষ্ট নয়। বৈশ্বিক নেতৃত্ব তার অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের মতোই অতুলনীয় এবং তার অতুলনীয় নেতৃত্বের সম্পূর্ণ বিস্তৃতি তার প্রশংসা ছাড়া বোঝা যায় না।

অনেকের হয়তো মনে নেই যে, ২০ সালে শেখ হাসিনাসহ ১৮৯ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান মিলেনিয়াম ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। তিনি কেবল সেই ঐতিহাসিক দলিলের স্বাক্ষরকারী হিসাবে ইতিহাসে নিজের জন্য একটি স্থান তৈরি করেননি; কিন্তু এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে একটি বৈশ্বিক অঙ্গীকারের অংশীদার করে তুলেছেন। সেই অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে তিনি বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ৮টি সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অঙ্গীকার করেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের হার ১৯৯০ সালের ৫৮ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৫৮ বছর থেকে বেড়ে ৭৩ বছর হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ৩৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১০০ থেকে কমে প্রতি হাজারে ২১ হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৩৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি ৩৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত

হয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে – ১৯৯০ সালে ৩০০ ডলার থেকে ২০১৯ সালে ২,৬৪০ ডলারে।

প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জন প্রতিবেশী দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে গড় আয়ু ৭৩ বছর, ভারতে ৬৯ বছর এবং পাকিস্তানে ৬৭ বছর। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩১ জন, ভারতে ৩৮ জন, পাকিস্তানে ৬৭ জন।

২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং এই লক্ষ্যগুলি তার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, নারী অধিকার, শিশু সুরক্ষা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত ও অভিনন্দন। আমরা সবসময় তাকে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থে কথা বলতে দেখেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড এই লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, নারী অধিকার, শিশু সুরক্ষা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃত ও অভিনন্দন। আমরা সবসময় তাকে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থে কথা বলতে দেখেছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আজ আমরা ২০৪১ সালের দিকে তাকিয়ে আছি, যখন আমরা বিশ্ব দরবারে উন্নত বিশ্বের অংশ হতে চাই। ভবিষ্যতের দুনিয়া দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আজ আমরা যে বিশ্বে বাস করছি, সেখানে বৈষম্য, অস্থিতিশীলতা এবং অপর্যাপ্ততা বাড়ছে। সুযোগ যেমন আছে, তেমনি দুর্বলতাও তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের এমন একজন নেতা দরকার, যিনি শুধু তার দেশের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন একজন নেতা- বিশ্বের আলো।

শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দিচ্ছেন। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকভাবে চান শিক্ষার্থীরা শুধু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করুক,

বাকিটা সরকারের দায়িত্ব। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সময় অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী চান বাংলাদেশের শিশুরা শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হোক। উপযুক্ত শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি সবাইকে সত্যিকারের শিক্ষিত শিশু হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র হলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে তিনি সংখ্যালঘুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ভারতকে টপকে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা দেশবাসীর সেই স্বপ্ন সঠিক পথে বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আওয়ামী লীগের সরকার দৃঢ় করে দেশের মানুষ আজ সুখ-সমৃদ্ধির নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।

সবার কল্যাণই শেখ হাসিনা সরকারের ঘোষিত নীতি। ১৪ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে ৩০ ধরনের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কারণে স্বাস্থ্য অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত একটি রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ওই রেজুলেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মডেল প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য উদ্ভাবনী নেতৃত্ব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে বলে বাংলাদেশে জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন জানিয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল তৈরি করায় জাতিসংঘের স্বীকৃতির পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটি।

শুধু স্বাস্থ্যখাত নয়, ভূমিহীনদেরও বিনামূল্যে ঘর দিচ্ছে সরকার। সরকার শুধু ঘর নির্মাণের মাধ্যমে তার দায়িত্ব পালন করছে না, সরকারি প্রকল্পগুলো তাদের জীবন ও জীবিকাও প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ২১টি জেলাকে গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি মুজিববর্ষে প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯টি, দ্বিতীয় ধাপে ২০ জুন ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং তৃতীয় ধাপে ২ দফায় মোট ৫৯ হাজার ১৩৩টি ঘর বিতরণ করা হয়। আরও ২২ হাজার ১০১টি ঘর বিতরণের মাধ্যমে

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৫ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে করোনাভাইরাস মহামারির সময় বাংলাদেশের জনগণ বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দেশের মানুষের জন্য সঠিক সময়ে টিকা আনতে পারে। এই সাফল্যের মূল কারিগর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কোভিড-১৯ মোকাবেলার পাশাপাশি তিনি সে সময় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাফল্যে বিস্ময় প্রকাশ করেছে বিশ্ব। সে সময় বেশ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামসহ বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশের প্রশংসা করেছিল। করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পর বিশ্বের অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। করোনার কারণে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করা সমালোচকদের মুখে বাংলাদেশের উন্নয়ন ছিল একটি থাপ্পড়।

শেখ হাসিনার হাত ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখন লাল-সবুজের দেশটি স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যেখানে সকল নাগরিক সেবা হাতের নাগালে পাওয়া যাবে। এই ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশের কেউ ক্ষুধার্ত থাকতে পারবে না। আওয়ামী লীগ সরকার সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরের সাফল্যই নৌকার বিজয়ের আসল হাতিয়ার।

যখন বাংলাদেশের সংকট তীব্র হয়, সবকিছু যখন অনিশ্চয়তাকে ঘিরে ঘোরে, বাংলার আকাশে কালো মেঘ জমে থাকে, তখন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ান। একজন মানুষ অদম্য সংকল্প ও নিষ্ঠার সাথে ভয়ের কালো মেঘ মুছে দেয় এবং দেশের মানুষ আশার আলো দেখতে পায়। যখনই মনে হয় যে সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটি খারাপ সময়ের মুখোমুখি হয়, একমাত্র ত্রাণকর্তা যিনি দক্ষতার সাথে খারাপ দুঃস্বপ্নদূর করেন তিনি হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার পরিচয় একজন প্রধানমন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার চেয়েও বেশি, তিনি একজন অদম্য সাহসী মানুষ। তিনি একজন যোদ্ধা এবং একজন অভিভাবক। তিনি সাহসের সাথে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা করেছেন। এখন তিনি বিশ্বের সেরা উদাহরণ এবং বিশ্ব নেতারা বৈশ্বিক সংকট পরিচালনায় তার উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

লেখক: একজন কলামিস্ট ও গবেষক।

অর্থনৈতিক সক্ষমতা রক্ষা যখন আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য

অর্থনৈতিক সক্ষমতা রক্ষায় এখন আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর পরবর্তীতে স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্লোগান তাতে করে এই সক্ষমতা বৃদ্ধির ধাপ আরো বেশি বেগবান হয়েছে। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রায় এক দশক পরে দেশের কৃষিখাতে কর্মক্ষম মানুষের অংশগ্রহণের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। শুধু বিগত পাঁচ বছরে কৃষিখাতে এ সংখ্যা বেড়েছে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ। এরকম ভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাত নানাপরিক্রমায় এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে বেকারত্বের হার ও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে।

কৃষি বিপণন সহ বিভিন্ন সেবা খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যাবহারের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে অনেকেই নিত্য নতুন ব্যবসা ও ফ্রিল্যান্সীং এর আওতায় এসেছে। ফলে ঘরে ঘরের বাইরে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিবান্ধব প্রেক্ষাপট কে সামনে রেখে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ কে মাথায় রেখে বর্তমান সরকার ক্যাশলেস সোসাইটি বিনির্মাণে বদ্ধ পরিকর। এই সোসাইটির তৈরীর জন্য যে ধরনের ইকো সিস্টেম তৈরী করা প্রয়োজন তার জন্যও এই সরকার কাজ শুরু করেছে।

ক্যাশলেস সোসাইটির ধারনা নতুন কিছু নয়। বিনিময়ের অসংখ্য পদ্ধতির মধ্যে ক্যাশলেস বিনিময় মাধ্যম বর্তমানে বেশ আলোচিত ও গ্রহনযোগ্য। আজকের পটভূমিতে নগদহীন সমাজ বলতে বোঝায় প্রকৃত ব্যাঙ্কনোট, কয়েন বা চেকের পরিবর্তে ডিজিটাল তথ্য (সাধারণত অর্থের ইলেকট্রনিক উপস্থাপনা) মাধ্যমে পরিচালিত আর্থিক লেনদেন ।মূলত ক্যাশলেস বলতে বোঝায় নগদ অর্থবিহীন লেনদেন, যেখানে ক্যাশ বা নগদ অর্থ ব্যবহার ছাড়াই লেনদেন করা হয়। নগদবিহীন লেনদেনের

মধ্যে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, মোবাইল অ্যাপসে পেমেন্ট, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং অন্য যেকোনো অনলাইন পেমেন্টে করা অর্থ আদান-প্রদানও অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে বাংলাদেশ বেশ কিছু সেক্টরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ক্যাশলেস ব্যবস্থা ব্যবহারের অনস্বীকার্য অনেক সুবিধা আছে যেমন ক্যাশলেসের ব্যবস্থার মাধ্যমে যেকোনো সময়, জায়গা থেকে সহজে ও দ্রুত লেনদেন সম্পন্ন করা যায়, ক্যাশলেস ব্যবস্থায় টাকা তৈরির খরচ কম আসে, অতিরিক্ত টাকা সঙ্গে না রাখার জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়, আর্থিক অপরাধ সংখ্যা কমে যায়, এ ব্যবস্থায় কর ফাঁকি দেয়ার সম্ভাবনা নেই, প্রতিটি লেনদেনের রেকর্ড রাখা সম্ভব, নকল বা জাল টাকার জালিয়াতি থেকে সুরক্ষিত, হাতে ধরা টাকাপয়সার আদান-প্রদান বন্ধ হওয়ার কারণে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ কম থাকে এবং সর্বোপরি পরিবেশবান্ধব নগদবিহীন লেনদেন ব্যবস্থায় বিশ্বে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে সহায়তা করে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের অনেক সেবাখাত তাদের সেবাগুলোকে সহজতর করার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে নগদবিহীন লেনদেন পরিচালনার জন্য সকল ব্যাংকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। এই বিবেচনায় ২০২১ থেকে ২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে, তার একটা কাঠামো পরিকল্পনা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করে ফেলেছে, যা জনগণের জন্য অন্যতম আশীর্বাদ বয়ে আনবে। এরই ধারাবহিকতায় সকল বানিজ্যিক ব্যাংক ও এসকল নির্দেশনা মেনে তাদের লেনদেন কে ডিজিটালাইজড করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। ক্যাশলেস উদ্যোগকে জনপ্রিয় ও প্রচলিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে যে, পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ, কার্ড বা চেক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নগদ অর্থে পরিশোধ ঝুঁকিপূর্ণ, চেকে পরিশোধ সময়সাপেক্ষ ও জটিল। অন্যদিকে কার্ড ব্যবহারের জন্য ব্যাংক বা এমএফএসগুলোকে ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো বিনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বিপুল বিনিয়োগ করতে হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় রাজধানীর একটি হোটেলে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেশন প্লাটফরম

(আইডিটিপি) ‘বিনিময়’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, শতভাগ মানুষকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেবার আওতায় নিয়ে আসার অংশ হিসেবে ক্যাশলেস সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের লক্ষ্যের কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবারও জয়লাভ করে ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং আমাদের সরকারের পরবর্তী মেয়াদে তারা ক্যাশলেস সমাজে বাস করবেন যা এই সবরকারের স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নকে আরো বেশী ত্বরান্বিত করবে।

বর্তমানে মুঠোফোনের মাধ্যমে পরিচালিত আর্থিক সেবা বা এমএফএসে এখন প্রতি মাসে লেনদেন হচ্ছে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এ ছাড়া এটিএমে লেনদেন হয় প্রায় ২৯ হাজার ৫৪১ কোটি টাকা, পয়েন্ট অব সেলসে ২ হাজার ৬১৬ কোটি টাকা, ক্যাশ রিসাইক্লিং মেশিনে ৬ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা এবং ই-কমার্সে ১ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, গত জানুয়ারিতে এসব সেবায় লেনদেন হয়েছে ১ লাখ ৫৯৩ কোটি টাকা। দিনে দিনে এসব সেবার ব্যবহার বাড়ছে, যা আনুষ্ঠানিক লেনদেনের আকারকে আরও বড় করছে। এর আগে গত বছরের এসব সেবায় লেনদেন প্রথম বারের মতো এক লাখ ৭ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল। মোবইল ব্যাংকিং সেবাটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে চালু হলেও এখন শহরে বসবাসকারী নাগরিকেরাও এর বড় ব্যবহারকারী। ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে এই সেবা এখন শুধু টাকা পাঠানো ও গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং বিল পরিশোধ, কেনাকাটা, মোবাইল রিচার্জ, টাকা জমানো, ঋণ গ্রহণসহ নানা ধরনের লেনদেন করা যাচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানের চেয়ে ৫-১০ গুণও বাড়তে পারে। ভবিষ্যতের এ অদম্য অগ্রযাত্রায় সবাইকে শামিল হতে হলে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। আমাদের জনসংখ্যার বিরাট অংশ তরুণ জনশক্তি। তাদের দক্ষ ও যোগ্য করতে পারলেই নতুন প্রজন্ম পাবে নতুন এক বাংলাদেশ।

উন্নত বিশ্ব প্রযুক্তি ব্যবহারে আজ যে পর্যায়ে এসেছে, তার কাজটা শুরু হয়েছিল আজ থেকে তিন দশক আগে। তারপরও এখন দেশ যে শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে এমন দাবি করার সময় এখনো আসেনি। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক সময়েই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে বলেই সবার বিশ্বাস। এখন শুধু প্রয়োজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ উদ্যোগকে

সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া। এ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উচিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা। তাহলেই খুব দ্রুতই স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় শামিল হবে বাংলাদেশ। এর ফলস্বরূপ নির্মিত হবে ক্যাশলেস সোসাইটি। এর মাধ্যমে শত সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বপ্নের এ সোনার বাংলা এগিয়ে যাবে বহুদূর।

লেখক: প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাঙ্গনে এখন সন্ত্রাস নেই কেন?

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করতে প্রয়োজন ছিলো সুশিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, যাতে ছোট্ট আয়তনের দেশটি অধিক জনসংখ্যার চাপ কিছুটা হলেও সামাল দিতে পারে।

তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া খাতগুলোর একটি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাখাতটি গুরুত্ব পেয়েছিলো বলেই স্বাধীনতা অর্জনের ছয় মাসের মধ্যেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রেখে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে গঠন করা হয় একটি কমিশনের।

গত দশ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ সমতা বিধানের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পগুলো ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।
অন্যদিকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপবৃত্তির টাকা অনলাইনে প্রদান করেছে।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আর শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা

অর্জনের ক্ষেত্রে রীতিমতো বিপ্লব ঘটেছে বাংলাদেশে যা, বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুকরণীয়। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগ, ছাত্র-ছাত্রীর সমতাসহ শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোল মডেল এখন বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামসহ আন্তর্জাতিক দাতা ও গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রগতিকে অন্যদের জন্য উদাহরণ হিসেবে অভিহিত করেছে। শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে বাংলাদেশ ছুঁয়েছে নতুন মাইলফলক।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ হওয়ায় বাংলাদেশ টেকশই ফল বয়ে এনেছে। লাখ লাখ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা, নারী সাক্ষরতার মহার বৃদ্ধি মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। গড়ে ওঠে নতুন নতুন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ২০০৯ থেকে গত ১০ বছরে দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। দেশে নতুন ২২ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে বেসরকারি উদ্যোগে ৫২ টি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে Accreditation Council আইন পাস করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ লাখে উন্নীত হয়েছে।

শিক্ষার গুনগত মান উন্নোয়ন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি দেশের সার্বিক ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হয়েছে। শিক্ষার কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক ডিজিটালাইজেশন হওয়ার কারনে শিক্ষাক্ষেত্রে দুনীর্তি রোধ হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ উন্নতি হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম আর নেই।

পূর্বে ‘শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস’ এই কথাটি জনগণের মনে ভীতির সৃষ্টি করতো। এক সময় ছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয় যেনো হয়ে উঠছিল রাজনৈতিক সন্ত্রাস এর স্থান, জামায়াত ইসলামি এবং বিএনপি যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিল তখন ছাত্রনেতাদের উদ্বত্ব যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশের জন্য হুমকিতে পরিণত হয়েছিল,

সুষ্ঠুভাবে ক্লাস ও পরীক্ষাতো দূরের কথা ছাত্র-ছাত্রী/কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভীতির সমুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস যেন পরিণত হয়েছিল সন্ত্রাসীদের স্থায়ী বাসস্থান।
সাধারণ ছাত্রদের কোন স্থান ছিলনা সেখানে।

কেউ যদি কোনদিন কিছু বলার সাহস করতো তাহলে তার হাত ও পায়ের রগ কেঁটে দিয়া হতো নিঃসংশ ভাবে, সর্বস্তরে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় মন্থর হয়ে পরেছিল।

বর্তমান সরকার তাদের সুদক্ষ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস মুক্ত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, এখন প্রতিটি বিভাগীয় শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষানীতি যেমন- ভর্তি করণ, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা বিভিন্ন জাটিল প্রক্রিয়াগুলি মানুষ নির্বিঘ্নে করতে পারছে। এখন আর নেতাদের চাপের মুখে পরতে হচ্ছে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম এখন সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হচ্ছে।

টেন্ডার জমা দেওয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পর্যন্ত অনলাইন এর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এই সুযোগ গুলির কারণে এখন আর সন্ত্রাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান পাচ্ছে না।

অধ্যাপক ড. হিমাংশু ভৌমিক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

জনগণ কি আগুন সন্ত্রাস চায়?

বৈশ্বিক মন্দাবস্থা, যুদ্ধাংদেহী আবেশের মোড়কে চলমান আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, সদ্য প্রয়াত করোনা মহামারীর প্রবল আঘাতসহ নানান প্রতিকূলতাকে তোয়াক্কা না করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত এক যুগে বাংলাদেশের উন্নয়নের মহাসোপান

যেখানে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে একটি উন্নত স্মার্ট বন্দরে সফল নোঙরের উদ্দেশ্যে, সেখানে এই অদম্য যাত্রাকে বাঁধা দিতে আবারো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে স্বাধীনতাবিরোধী, জঙ্গিগোষ্ঠীর মদদদাতা, এবং সন্ত্রাসীগোষ্ঠী হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিএনপি-জামায়াত রাজনৈতিকি গোষ্ঠী। যেখানে চলমান আওয়ামী লীগ সরকার ‘ডিজিটাল’, ‘স্মার্ট’, ‘ভীশন’, ‘টেকসই উন্নয়ন’, ‘রূপকল্প – ২০৪১’, ‘ডেল্টা প্ল্যান – ২১০০’, ‘মহা প্রকল্প’, ‘উন্নয়নের মহাসড়ক’ ইত্যাদি ইতিবাচক শব্দগুচ্ছকে সোনার বাংলার অভিধানে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে আরেকটি দল ইতিবাচক কোন কিছু উদ্ভব করায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় তো দিয়েছেই বরংচো বাংলার মানুষকে পরিচিত করেছে ‘আগুনসন্ত্রাস’ নামক একটি চরম নেতিবাচক শব্দের!

গত এক যুগে তিন দফায় নির্বাচিত আওয়ামীলীগ সরকারের সুদক্ষ পরিকল্পনায় দক্ষিন এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক হাব হয়ে ওঠা এই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বদ্বীপটির জনগন আজ সেই সব স্বপ্নগুলোর বাস্তব চাক্ষুষ সাক্ষী হতে পেরেছে যা হয়তো একসময় ছিল কল্পনার অতীত। আজ বাংলাদেশ এর রয়েছে দেশের দীর্ঘতম ও বিশ্বের গভীরতম পিলার বিশিষ্ট পদ্মা সেতু, দক্ষিন এশিয়া তথা দেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথ কর্ণফুলী টানেল, দেশের প্রথম পরমানু ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেল, উড়াল সড়ক, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ আরও অনেক মহাপ্রকল্প। যেখানে ২০০৯ এ মাত্র ৪৭ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ এর আওতাভুক্ত ছিল সেখানে আজ শতভাগ মানুষ পাচ্ছে বিদ্যুৎ সুবিধা, নতুন রেলপথ নির্মিত হয়েছে ৪৫১ কিলোমিটার, পুনর্বাসিত হয়েছে আরও ১ হাজার ১৮১ কিলোমিটার রেলপথ, নির্মিত হয়েছে ৪০০ এরও বেশী রেলসেতু। এছাড়াও দেশে এক যোগে উদ্ভোদন করা হয় ১০০ এরও বেশী সড়ক সেতুর। এতসব উন্নয়নের যাত্রায় আজ মানুষ সন্ত্রাসী বিরোধী দলের ডাকা কোন হরতাল, অবরোধ, নাশকতা কিংবা অগ্নিসন্ত্রাস চায় না।

দেশের এই দুর্বার এগিয়ে চলার পথে বাঁধা দেয়ার জন্য সেই শুরু হতেই জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি-জামায়াত জোট চালিয়ে যাচ্ছে হরতাল অবরোধের নামে তাদের আগুন সন্ত্রাস। জোটটি জানে বাংলার মানুষ তাদের অরাজকতা আর সহ্য করতে চায় না, তাই তারা বেছে নিয়েছে নৈরাজ্যের পথ। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ভয়ানক আগুনকে।

মূলত ২০১৩ হতে সূচিত হয় বিএনপি জামায়াত জোটের এই আগুন নিয়ে খেলা

যার বিভীষিকার কথা ভুলে যায় নি বাংলার জনগন। সে সময় যারা কখনও চায় নি বাংলাদেশ নামক একটি ভূখন্ড হোক, সেই ঘাতক, পিশাচ, যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে দলটি প্রায় ৪১৯ টি পৃথক ঘটনায় ১৫ জন পুলিশ সদস্য সহ হত্যা করে ৪৯২ জন নিরপরাধ মানুষকে। এ সকল অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডে আহত হয় প্রায় আড়াই হাজারের মত মানুষ। এরপর ২০১৪ সালের নির্বাচন কালীন সময়ে তারা দেখায় তাদের ভয়ংকরতম রূপটিকে।

এসময় তারা আগুন ধরিয়ে দেয় সারাদেশের প্রায় ৫৮২ টি ভোটকেন্দ্রে, শত শত যানবাহনে, রাস্তার পার্শবর্তী বৃক্ষরাজিতে, এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসানালয়ে। নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় যেনে তারা পেট্রোল বোমায় পুড়িয়ে মারে বহু নিরপরাধ সাধারন জনগনকে। অগ্নিদ্গধ অসহায় মানুষদের কান্নার আহাজারিতে প্রকম্পিত হতে থাকে সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালগুলো। নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার সহ এই সন্ত্রাসী জোট গোষ্ঠী হত্যা করে ২৬ জন মানুষকে। একবছর পর ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারী যখন আওয়ামী লীগ সে মেয়াদ কালের তাদের প্রথম বর্ষ উদযাপন করছিল, সেদিনও আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আগুন সন্ত্রাসেরা। সেসময় ২ হাজার ৯০৩টি বাস-ট্রাক, ১৮টি ট্রেন, ৮ টি যাত্রীবাহী লঞ্চ, ৭ টি ভূমি অফিসসহ ৭০ টি সরকারি অফিসে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মারে সন্ত্রাসী সংগঠনটি। এসব ঘটনায় নিহত হয় ২৩১ জন মানুষ এবং গুরুতর আহত হয় ১ হাজার ২ শত মানুষ। এরপর থেকেই পুরোপুরিভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বিএনপি-জামায়াত জোট গোষ্ঠী। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায় সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে। সর্বশেষ চলতি বছরের ১৫ জুন কানাডার টরেন্টোর আদালতে এক মামলায় বিএনপিকে ৫ম বারের মত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এতকিছুর পড়েও আগুন নিয়ে খেলা পুরোপুরি শেষ হয় নি দলটির। ২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর ঢাকায় উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর ডাকা সমাবেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে অগ্নি সংযোগ ঘটায়। কিন্তু বাংলাদেশের সচেতন জনগন তাদের এসব নৈরাজ্য ও অরাজকতাকে তুমুলভাবে প্রত্যাখান করে। বাংলাদেশের মানুষ এখন এগিয়ে যাওয়ার পথে, তারা শুধু স্বপ্ন দেখে উন্নত এক ভবিষ্যৎ এর। এই পথে এই দেশের জনগন কখনো মেনে নেয় নি এবং মেনে নেবেও না আগুন সন্ত্রাসকে।

লেখক: অধ্যাপক, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সাইন্স বিভাগ এবং প্রক্টর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়।

পর্যটনের নতুন দিগন্তে পদ্মা সেতু

পদ্মা সেতুতে রেল চলাচল শুরু হওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের নবদিগন্ত উন্মোচিত হলো এবং বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়েছে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে এলাকা। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল করছে। পর্যটন সম্ভাবনার বৃহৎ উৎসস্থল হলো পদ্মা সেতু।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাংলার মানুষের বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণের অনন্য উদাহরণ। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর জেলার জাজিরাসহ দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক যোগসূত্র স্থাপন হবে।

এই যোগসূত্র স্থাপনের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশের অনন্য অবদান রাখবে। পদ্মা সেতু দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পদ্মা সেতুর দুই পাড় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক পদ্মার দুই পাড়ে নান্দনিক সৌন্দর্য দেখার জন্য ঘুরতে যায়। মাওয়া ও শরীয়তপুর প্রান্তে রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, হোটেল-মোটেলসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে তিনটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে তন্মধ্যে ষাট গম্বুজ মসজিদ ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন এই দুইটি হেরিটেজ দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত তবে অতীতে ওই অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক পর্যটকদের পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র হওয়া স্বত্বেও ভ্রমণে আগ্রহ ছিল কম। পদ্মা সেতুর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলোতে ভ্রমণে আগ্রহ বাড়বে।

পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত

স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন বাস্তব। ঢাকার সাথে মংলা বন্দর, বরিশাল, কুয়াকাটা, পায়রা বন্দর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুরসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার অর্থনৈতিক খাতে এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

এই পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৩ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। দেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর ভূমিকা নিয়ে এর আগে বিশ্বব্যাংক বলেছিল, সেতু বাস্তবায়িত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে যাবে। আর প্রতি বছর দারিদ্র্য নিরসন হবে শূন্য দশমিক ৮৪ ভাগ।

দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলোর মধ্যে ভাসমান পেয়ারা বাজার, ঐতিহাসিক দুর্গা সাগর, কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইন্সটিটিউট, খান জাহান আলী সেতু, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, জাতিসংঘ পার্ক, দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স, বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের মাজার, রূপসা নদী, শহীদ হাদিস পার্ক, খানজাহান আলী কর্তৃক খননকৃত বড়দীঘি, খুলনা শিপইয়ার্ড, গল্লামারী স্মৃতিসৌধ ও বধ্যভূমি, জাহানাবাদ বনবিলাস চিড়িয়াখানা ও শিশুপার্ক, পিঠাভোগ, প্রেম কানন বকুলতলা, মংলা পোর্ট, রাড়ুলী, রেলস্টেশনের কাছে মিস্টার চার্লির কুঠিবাড়ি, সোনাডাঙ্গা সোলার পার্ক ও অন্যান্য পর্যটন আকর্ষণগুলোর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

পর্যটকেরা কুয়াকাটা সমুদ্রের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং খুব কম সময়ে সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণীয় স্পট-কচিখালী, কটকা সৈকত, জামতলা সী-বিচ, সুন্দরবন সংলগ্ন সাগরে জেগে ওঠা দ্বীপ পক্ষীর চর, ডিমের চর ঘুরে দেখার অপার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, পায়রা বন্দরকে ঘিরে পর্যটন সম্ভাবনার নতুন দ্বার খুলবে পদ্মা সেতু এবং মাত্র ৬ ঘণ্টায় উপরের উল্লেখিত পর্যটন আকর্ষণগুলোতে পর্যটকেরা যেতে পারবে।

অন্যদিকে কুয়াকাটার গা ঘেঁষে অবস্থিত ফাতরার চর, লাল কাকড়ার চর, শুঁটকি পল্লী, লালদিয়ার চর, চর বিজয়, ফকিরহাট, সোনার চর, ক্র্যাব আইল্যান্ড বা কম কী? একটি স্পট থেকে আরেকটি স্পট নান্দনিক এছাড়াও রয়েছে ভিন্ন রকম জীব-বৈচিত্র্যর সমারোহ। দারুণ সময় কাটাতে চাইলে এসব পর্যটন স্পটের জুড়ি পাওয়া কঠিন। রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা স্বল্প সময়ে পণ্য পরিবহন করে মংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি গতিশীল হবে এবং রপ্তানি

আয় বৃদ্ধি হবে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত (যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকন করা যায়), ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন সংলগ্ন ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে মালদ্বীপের ন্যায় পর্যটন আকর্ষণ তৈরি করা সম্ভব এবং সুন্দরবন ঘিরে ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম উন্নয়নের অনন্য সুযোগ রয়েছে।

প্রতিবছর পর্যটকবাহী ৪৫টি ক্রুজ ভারতে কুচবিহার-চেন্নাই-গোয়া হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারে চলে যায়। তবে এই ক্রুজগুলো যদি পায়রা বন্দরে আকৃষ্ট করা যায় তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। পদ্মা সেতু গতিশীল করবে মংলা ও পায়রা বন্দরকে যা সুনীল অর্থনীতিতে অনন্য অবদান রাখবে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল যেমন কুয়াকাটা, মংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর কেন্দ্র করে সমুদ্র পর্যটনের সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। নদীভিত্তিক ও সমুদ্রভিত্তিক পর্যটনে সময়োপযোগী সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের পাশাপাশি তৈরি করবে কর্মসংস্থান সুযোগ, শক্তিশালী হবে জাতীয় অর্থনীতি। তবে আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণের জন্য পদ্মা সেতুর ও দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণগুলো ছোট ছোট প্রমো তৈরি করে ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং করা প্রয়োজন।

লেখক: চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের অবদান

বাংলাদেশ আমাদের কাছে মাতৃস্বরূপ। বরাবরই এদেশের স্তন্যদায়ী গ্রামীণ প্রকৃতির আলো-বাতাস-জল এসবের লালিত্যে বাঙালির দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম বাংলা আমাদের জীবনে নিউক্লিয়াসের সমতুল্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশ একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দর্যের উৎস, তেমনি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের অন্যতম সরবরাহকারী ক্ষেত্র। আজ

শহরায়নের ফলে মানুষ অনেকবেশি শহরমুখী। জীবন ও জীবিকার তাগিদে সকলে শহরপানে ছুটে চলেছে। তাই শহরের ওপর চাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল।

কিন্তু শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আজ টেকসই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বাংলাদেশে মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির সম্প্রসারণের ফলেই দেশে আজ উন্নতির সুবাতাস বইছে। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গ্রাম অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন; গ্রামে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় আধুনিক উপকরণের সহজলভ্যতা; শিক্ষা, চিকিৎসা ও বৈদ্যুতিক খাতে অভাবনীয় উন্নতি সাধন; পাশাপাশি উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি গ্রামে সরবরাহের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে গ্রাম বাংলার জনজীবনের সংযুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের নিরলস পরিশ্রমের ফলে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশে আজ উন্নতির নৌকা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অবিরাম ছুটে চলেছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেলের মতো মেগাপ্রকল্প শেখ হাসিনা সরকারের হাত ধরে জাতির পিতার সোনার বাংলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে, শেখ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বের সুনাম বর্তমানে জাতীয় পর্যায়কে জয় করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে শহর অঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামীণ বা তৃণমূলে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের পাশাপাশি গ্রামের কাঁচা-মেঠোপথ পাকাকরণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার।

বর্তমানে বাংলাদেশে শহর কিংবা গ্রাম উভয় পরিবেশে জীবনযাত্রার মান প্রায় সমান। শেখ হাসিনার সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলার গ্রামও আজ শহরের মতো আধুনিকতার স্পর্শতায় পরিপূর্ণ। শেখ হাসিনা সরকার বরাবরই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করেছে। দেশের উন্নয়নের অভিযাত্রায় ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ সংযোজনটি গ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে ব্যাপক শক্তিশালী ভিত দান করেছে। আর বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের উন্নত জীবনযাপন ও দেশের শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতি বিনির্মাণের একমাত্র দাবিদার শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার নিঃসন্দেহে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলো প্রেতাত্মারা। কিন্তু শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগ সরকার জনগণকে আজ সেই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ প্রদান করেছে। বৈশ্বিক ও জাতীয় সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব। ফলে বর্তমানে দেশে উন্নয়নের সুফল সকলে পাচ্ছে এবং আয়ের বৈষম্য কমে মানুষের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে শেখ হাসিনার সরকার গ্রাম অঞ্চলে উন্নত রাস্তাঘাট, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ, গ্রামে গৃহহীনদের জন্য সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের মতো কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে আধুনিক জীবনযাপনের সকল উপকরণ নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র ও যান্ত্রিকায়ন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামে পর্যাপ্ত কর্মস্থাপনের ব্যবস্থা করে শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করে তুলেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সঠিক নেতৃত্বে আজকে প্রতিটি গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা কিংবা জেলা একসূত্রে যুক্ত।

গ্রাম ও শহর উভয়ের ব্যাপক উন্নয়ন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে সমবায় পন্থায় সৃষ্ট বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সফলতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নকে সমুন্নত রাখতে এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে আসন্ন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বের বিকল্প নাই। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতার মুজিবীয় আদর্শে বিশ্বাসী বাংলাদেশের আপামর জনগণ আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বকে পুনরায় বিজয়ী করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমুন্নত রাখবে নিঃসন্দেহে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়।